Rajshahi University journal of arts & law Vol. 49 (2021) pp. 11-18
ISSN 2309-0898

বঙ্গীয় নারীর সামাজিক অবস্থান: প্রসঙ্গ চম্পাবতী

ফাহমিদা সুলতানা তানজী[১]*

Abstract

In search of the right answer to the question that has arisen most of the time about feeble woman, Syed Shamsul Haque (27 December 1935 - 27 September 2006) is looking for a way to determine the social status of Bengali women there will be “woman” in the world is born a woman. After birth, women become helpless in the society due to various reasons. In this case, she is involved in self-sacrifice most of the time. But the Bengali society does not make this simple confession. So in order to manage her life, she demands a kind of answer to manage her life. In many cases, this helpless creature is freed from one cage and dies trying to enter another cage. She does not back down. They call it the writing of destiny just because it is useless. But this helpless creature is sometimes not a mere recourse to anyone, but at the cost of her own life, she goes on top of all debts by sacrificing personal interests. In patriarchal aesthetics, Syed Haq has very accurately transformed a helpless person into a being a conscious way.

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জ্ঞানচর্চার জগতে কখনও প্রেক্ষিত হিসেবে, কখনও পৃথক সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে নারী জাতিকে নিয়ে মানবীবিদ্যা নামে এক নতুন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। ১৯৬০ এর দশকে আমেরিকায় এবং ইউরোপে নারীবাদী আন্দোলনের যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তারই ফলে মানবীবিদ্যার উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটে। আঠারো শতক যদি হয় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ, তাহলে উনিশ শতক হলো সামাজিক ইতিহাসের। এই শতক যেন বাংলার মানুষের জীবনে বয়ঃসন্ধিকাল। প্রকৃত অর্থে যাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয় তার সাথে এর পার্থক্য হলো আবেগ ও প্রক্ষোভকে ঘিরে। নারীকে কেন্দ্র করেই এই শতকে অধিকাংশ প্রশ্নের জন্ম হয়েছিল যার যথার্থ উত্তর আজও আধুনিক বিশ্ব দিতে পারেনি। বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্য সমাজ যতটা উদগ্রীব, ঠিক ততোটাই উদগ্রীব বাস্তব জীবনে নারীকে পদপ্রান্তে বসিয়ে শাসাতে। পুরুষের কঠোর নিয়ন্ত্রণে এই নারী জাতি। এই নারীকে ঘিরেই বর্তমান প্রবন্ধ লেখার সূত্রপাত। আর এক্ষেত্রে প্রবন্ধকার অবলম্বন করেছেন এমন এক লেখকের, যিনি একালের এক অগ্রগণ্য উজ্জ্বল মনস্বী হিসেবে মৃত্যুর পরও পরিগণিত হচ্ছেন। নিজের জীবনচর্চার প্রাত্যহিক বৃত্তের মধ্যে থেকেও শিল্পের প্রতীকী ভুবন নির্মাণে সৈয়দ শামসুল হকের (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬) ‘চম্পাবতী’ নৃত্যনাট্যটি ভেতরগতভাবেই পারঙ্গম। নাটকটি শিল্পক্ষেত্র ও জীবনদৃষ্টি পরিবর্তনের সঙ্গে ধ্রুপদিযুগের একান্ত শিল্পবিচারের রীতিতে আবদ্ধ না থেকে নতুন শিল্পতত্ত্বের, নবতর শৃঙ্খলার অধীনে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবিক নারী জাতির অবহেলা ও অবমাননার দিকটির বাস্তবিক ও সাহসী শিল্পবোধের সযত্ন প্রয়োগ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। একুশ শতকের শিল্পচর্চার তো বটে, এর সাথে সাথে বাস্তবিক জীবনেও বঙ্গের এই নারী জাতি নানাভাবে উপেক্ষিত। বর্তমান প্রবন্ধে তর্কে জড়ানোর মধ্য দিয়ে অন্য তর্ক দিয়ে প্রবন্ধকার তালাশে লিপ্ত থাকবে বঙ্গীয় নারীর সমাজে দৃঢ় অবস্থানের পক্ষে।

শিল্প সৃষ্টির পথে শিল্পী স্বাধীন। এই স্বাধীন পথে চলতে সে প্রেরণা লাভ করতে পারে, কিন্তু ‘অনুকরণ’[১] শব্দটির সাথে জড়ালে তাকে রসের পেয়ালার সাথে আড়ি নিতে হবে। এই সহজ ইচ্ছা ও আন্তরিক

[1]* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ৪৩৩১, ই-মেইল: fahmida.tanjee@gmail.com

ইচ্ছার সম্মিলনে সৃজিত হয়েছে চম্পাবতী। নাটকটি একটি নির্দিষ্ট ফর্মে লেখা হলেও শিল্পরসিকের নীলাকাশে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে তার দ্যুতি। এতে নবরস রুচির সাথে শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে পাঠকের। চম্পাবতী নৃত্যনাট্যটি সৈয়দ হক পুনঃসৃজন করেন পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের 'বেদের মেয়ে' নৃত্যনাট্যটি পাঠান্তে।

> 'উত্তরবঙ্গের 'হুমরা বাইদ্যা' লোকনাট্যের কাহিনী অবলম্বনে বেদের মেয়ে' রচিত। জসীম উদ্‌দীন এই নাটকে প্রথম বাংলার লোকজীবনকে অবলম্বন করে কাহিনী গড়ে তোলেন। বেদে সমাজের এক বলিষ্ট চিত্র 'বেদের মেয়ে' নাটকে উপস্থাপিত হলেও চম্পার ট্র্যাজেডিই মূখ্যস্থান লাভ করেছে'।[২]

নাটকটি সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও সৈয়দ হক তাৎক্ষণিকভাবে এতে কলম ধরেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী লুবনা মারিয়ামের[৩] উৎসাহে সৃষ্টি হয়েছে নতুনভাবে বেঁচে থেকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেবার কাহিনি। নাট্যকার জসীম উদ্‌দীনের আখ্যানের অনেকাংশ পরিহার করে বাচনের এমন এক নকশাকে নাটকের ভেতরে বুনেছেন যা দেশজ নাট্যের শেকড় থেকে আসা এক *স্যালভেশন*। বাংলা লোকনাট্যের আঙ্গিক ও বিষয় সৈয়দ হক সচেতনভাবেই সংযুক্ত করেছিলেন। লোক আঙ্গিকের সাথে নারীর বেঁচে থাকার ঘৃণ্য কাহিনি আধুনিক অনেক নারীকেও নিজের অবস্থানের দিকে পুনঃদৃষ্টিপাত করতে উৎসাহিত করে। নাটক কালের মাত্রা ও স্থানের নির্দিষ্টতায় গঠিত এক শিল্প। শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো না কোনোভাবে দেশ, স্থান, কালের রূপ ফুটে ওঠে। নাটকে সৈয়দ হকের চম্পাবতী নাটকটিতে ফুটে উঠেছে স্বদেশের গ্রাম বাংলার চিরায়ত চিত্র। সৈয়দ হকের উদ্ভাবনীশক্তি, দেশজ নাট্যের গণ্ডির মধ্যে থেকে বর্তমান নারী সমাজকে উপস্থাপন করছে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে।

চম্পাবতী বেদে নারী। তার সঙ্গী গয়া বেদে। জীবীকার তাগিদে সাপের ন্যায় ভয়ঙ্কর সরীসৃপের ওপর অবলম্বন করতে হয় তাদের। যেহেতু তারা গোষ্ঠী প্রধান তাই দায়িত্বও বেশি। নৌকায় ভেসে বেড়ানো এই ভবঘুরের দল একবার বাংলাদেশের কোনো এক গ্রামে উপস্থিত হয় কিছু অর্থোপার্জনের আশায়। সেখানে আকর্ষণীয় চম্পাবতী পুরুষের লোলুপ নজরে পড়ে। শুরু হয় তার নারী ভাগ্যের করুণ ঘৃণ্য কাহিনি। নিজের জীবনের স্বর্বস্ব ত্যাগ করে সে স্বজাতিকে বাঁচাতে থেকে যেতে রাজি হয় গ্রামের মোড়লের বাড়িতে। এখানে নারী জীবনের দুর্ভাগ্যের সাথে সাথে চম্পাবতীকে ভিন্ন জাতের সংস্কৃতি চর্চা করতে এক প্রকার বাধ্য করা হয়। পুরুষতন্ত্রের রচিত ইতিহাসে চম্পাবতী সবই মেনে নিয়েছিল। সে নির্বাক থাকতে বাধ্য হয়েছিল। গয়াবেদেকে নিয়ে মিথ্যা স্বপ্নের জাল বুনে অপেক্ষার প্রহরগুণে গেছে, সেই গয়াবেদেও ভিন্ন নারীকে (আসমানি) ঘিরে রচনা করেছে ভাসমান নতুন সংসার। এই তো নারীর জীবন। আসমানি গয়ার জীবনে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ভাবতে থাকে। অন্যদিকে চম্পাবতী অন্বেষণে লিপ্ত হয় তার প্রাণের তাগিদের, যেখানে তার মুক্তি। সে ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় মোড়লের গৃহস্থলীর উপহার। কারণ এটি তার আত্মশক্তি ভোঁতা করার চেষ্টা চালানোর প্রচেষ্টা। সে মুক্তির আওয়াজ তুলতে বারবার মাথা উচুঁ করার চেষ্টায় রত হয়, পারে না নারীজন্ম বলে। অবশেষে মাথা তুলে দাঁড়াতে সে সক্ষম হয় যখন মোড়ল উচ্চারণ করে 'বেজন্মা'[৪] শব্দটি। এখান থেকে চম্পার বিরোধিতা শুরু যখন থেকে পুরুষের মিথ্যা ছায়ার তলে চলতে চম্পা পুরোমাত্রায় অক্ষম হয়ে যায়। সে কঠিন পরিস্থিতির মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করে। মহাবিশ্বের সাপেক্ষে নিজেকে নগণ্য এবং পরিপূর্ণ মাত্রায় অসহায় বলে মনে করে সে। এহেন পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসে মোড়লপত্নী। সংসার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে সে নারী কিংবা পুরুষ নয়– মানুষকে দেখতে চায়। তাই তার স্নেহশীল তত্ত্বাবধানে চম্পার মোড়ল নামক কারাবাস থেকে ঘটল মুক্তি। প্রশ্ন থেকে যায় তার মুক্তির প্রসঙ্গকে ঘিরে। এক খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়ে আরেক খাঁচায় স্বেচ্ছায় বন্দী হবার জন্য ছুটে চলে। এছাড়া ভিন্ন কোনো পথ তার জানা নেই। পুরুষের মিথ্যা স্বপ্নজালের

মায়ায় নারী নিতান্ত অসহায়। পুরুষ শত শত বছর ধরে যে কল্পকাহিনি সৃষ্টি করেছে নারীকে ঘিরে, নারী সেখানে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেনা। কল্পকাহিনিকেই সে সত্য বলে মেনে নেয়। চম্পার জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। গয়ার কাছে ছুটে যায় সে। পুনর্বার সে নিজেকে নিঃশেষ হবার মহাগৌরব থেকে বঞ্চিত হতে দেয়নি। সর্পে দংশিত গয়াবেদের শরীরের সমস্ত বিষ শুষে নেয় অম্লান বদনে। যার অনিবার্য ফলাফলকে চম্পা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আলিঙ্গন করে নিয়েছে। চম্পার এই আত্মত্যাগ কেবল মানবীয় বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এতে রয়েছে নারী জীবন পরিচালনা করার পথে অন্তরায় এবং তা অপসারণ করা সহজ কোনো বিষয় নয়।

পৃথিবীতে কোনো নারী 'নারী' হয়ে জন্মায়না। এই স্ত্রীজাতির মধ্যে কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে। এরিস্টটল বলেছেন, 'নারী বিশেষ কিছু গুণাবলির অভাবে নারী।'[৫] প্রাকৃতিকভাবে সত্য এই যে, জৈবিকভাবে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট জীবের একটা অংশ স্ত্রী অঙ্গ নিয়ে জন্মায়। প্রাকৃতিক সত্য কেবল এটাই। জন্মলগ্নে কোনো শিশুই জানে না সে নারী নাকি পুরুষ। এমনকি বোধ হওয়া অবধি তাকে অপেক্ষা করতে হয় সামাজিক এই শ্রেণিবিভাজন বোঝার জন্য। এরপর যে শিশুটি স্ত্রী অঙ্গ নিয়ে জন্মায় তাকে টিপ পরিয়ে, ঝুঁটি বেঁধে ক্লিপ পরিয়ে, সুন্দর বেশ ধারণ করিয়ে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় পুতুল ও রান্না করার খেলনাপাতি। এভাবেই ধীরে ধীরে তার মাঝে মেয়েলি ভাব জন্মাতে থাকে, তার সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কোড অব কন্ডাক্টের নানান বিধিনিষেধ। লিঙ্গের কৃত্রিম ধারণা সমাজই তার মনের গহিনে বপন করে দেয়। নারীকে ঘিরে পুরুষের রচিত শোষণের বিন্যাস ও পদ্ধতিটি এতটাই সূক্ষ্ম ও নিখুঁত যে, নারী নিজেকে ভালো করে চেনার বা পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ পায়নি, উপলব্দি করতে পারেনি কত হাজার বছরের নিপীড়নের চিহ্ন তার দেহ ও মনে। তাই অধিকাংশ নারী মেনে নিয়েছে পুরুষের আধিপত্য। আর পুরুষ নারীর সাথে সবচেয়ে অন্তরঙ্গতম জৈব-সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ থেকেও পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র ও নিষ্ঠুরতম প্রাণীর মতো অব্যাহত রেখেছে তার শোষণ ও শাসনের প্রক্রিয়া। 'রূপোর দ্য ইউরিয়েল'-এ বেন্দা লিখেছেন, "নারীর শরীরের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও পুরুষের শরীর নিজেই অর্থ প্রকাশ করে, অন্যদিকে নারীর শরীর একলা নিজে তাৎপর্যহীন।" [৬] পুরুষ কর্তৃক রচিত বর্তমান সভ্যতার একটি চরিত্র হলো একটি দল বা ব্যক্তি কর্তৃক আরেক দল বা ব্যক্তিকে শোষণ; শোষিতের দল বা শ্রেণি হিসেবে নারী সমাজ সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে সম্পৎশালী এবং লোভনীয়। শোষণের এই নিশ্চিত ক্ষেত্রটি পুরুষ হাতছাড়া করতে চায় না। শোষণের এই ক্ষেত্রটি এতই লোভনীয় যে, এই করোনাকালীন দুর্যোগেও তারা হাতছাড়া করতে চায়নি– 'নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় এক গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানি ও নির্যাতন করেছে কয়েকজন দুর্বৃত্ত। সম্প্রতি উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। রবিবার (৪ অক্টোবর) বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে'।[৭] আর এই কারণেই পুরুষ কেবলই লিঙ্গ আর নারী স্ত্রী লিঙ্গ।

'চম্পাবতী' নাটকটিতে দেখা যায় মোড়ল নামক কারাবাসে থেকে মোড়লপত্নীর প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত, সেখানে আবার নতুন সংযোজন চম্পাবতী। এই যে দুই নারী সমাজে মুক্তি চায় এবং কীরূপে তা সম্ভব তাও একসময় বিধির কল্যাণে স্থির হয়। অর্থাৎ, নারী যদি নিজ থেকে মুক্তি চায় তবে সে তা পেতে পারে। এজন্য পুরুষের দয়ার ওপর নির্ভর করলে চলে না। সাধারণভাবে নারীর জন্য সমাজে জীবনযাপন করাটা তেমন সহজ নয়, যেমন সহজে বসবাস করে এদেশের পুরুষ। নারী কিংবা পুরুষ উভয়েই সভ্যতার সভ্য, সেই সভ্যতার পক্ষ থেকে উভয়ের ওপর কিছু নিয়ম বর্তায়। সভ্যতার টিকে থাকার লড়াইয়ে নারী কিংবা পুরুষ উভয়ের ওপর কিছু নিয়ম বর্তানোর ফলে কিছু পরিমাণ ভোগান্তি তারা উপহার হিসেবে পায়। বলাই বাহুল্য নারী পুরুষের তুলনায় এই উপহার কিছু মাত্রায় বেশি ভোগ করে।

এর সাথে যুক্ত হয় অবশীভূত প্রকৃতির অনিষ্ট, যাকে আমরা নিয়তি রূপে সম্বোধন করে থাকি। 'চম্পাবতী' নাটকটি থেকে জানা যায় অনিষ্ট মোকাবিলা করার জন্য চম্পাবতী কীরূপ ভূমিকা পালন করেছে, সেই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ নেয় মোড়লপত্নী।

"মোড়ল পত্নী- কত্ত বড় বুকরে পাটা। আমরই সাক্ষাত?
নারীর গায়ে হাত।
.....
লাথি মারি এমন স্বামীর মাজায়।
ছাইড়া দিলাম পঙ্খী তোমার। – উইড়া যারে বইন"।(৮)

মোড়লপত্নী সমাজের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা থেকে মুক্ত করে দেয় চম্পাবতীকে অর্থাৎ নিয়তির বিপরীতে দাঁড়িয়ে তারা নিজেরা নিজেদের রক্ষা করেছে– যে–কি না, শোষকের মতই তাদের উভয়কে শাসিয়েছে বারবার। এখানে দুই নারীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় নিয়তির বিপরীতে আছে তাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি যার মাধ্যমে চম্পা এগিয়ে যেতে পেরেছিল, যদিও মোড়লপত্নী রয়ে যায় মোড়ল নামক কারাবাসেই, সে চম্পার যন্ত্রণা লাঘবের জন্য চেষ্টা করে গেছে। নাটকটির অমোঘ সত্য এই যে, নাট্যকার স্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন; পুরুষের বিপরীতে নারীকে রক্ষার কাজে যবনিকা না টেনে কিছু উপায়ে সমাজই নারীকে পুরুষের অধস্তন করে রাখতে চায়। চম্পার ভীষণ রকম ত্রাসসঞ্চারিত মন চায়, মোড়ল নামক কারাবাস থেকে মুক্তি নিয়ে গয়ার জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রবলতম বাস্তবিক স্বার্থ থেকে উদ্বেলিত চম্পার মন একরকম উত্তর দাবি করে। তবে আমাদের প্রাণে যেমনটা হয় তেমনটা যদি প্রকৃতির উপাদানগুলোর মাঝেও থাকে, প্রকৃতি যদি তার কোমল অঙ্গ দিয়ে নারীকে ঘিরে রাখে তবে তারা স্বস্তিতে শ্বাস নিতে পারতো, শত দুর্জ্ঞেয়তার মাঝে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করতে পারতো। কিন্তু শত চেষ্টার পরও নারী প্রতিরক্ষাহীন। "এর কারণ হচ্ছে নারীদের এমন কোনো বাস্তব সম্বল নেই।"(৯) তবে হয়তো নারী পূর্ববৎ নিঃসহায় রকমের অবশ নয়, অন্ততপক্ষে এভাবে নারী সম্পর্কে বর্তমানে প্রতিক্রিয়া জানানো যায়। চম্পাবতী চরিত্রটির দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার লড়াইয়ে ও স্বজাতিকে রক্ষার্থে প্রচলিত সহজ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছে।

'চম্পা: আমার স্বজন আইজ আমার স্বজন
হইতাছে নিধন।
আমি অভাগিনী আমারই কারণ।
....
নিজের ইজ্জত দিয়া বাঁচে যদি বাইদ্যা বংশ তবে-
অসতী আমারে লোকে কয় যদি কবে,
তবু জাতি রক্ষা পাবে, আমি রাজী হই-
মাথার উপরে আল্লা, মাফ করবেন নিশ্চই"।(১০)

এভাবে সে তার ঈশ্বরকে তুষ্ট করার, দোহাই দেবার, প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে এবং কিছু মাত্রায় নিজেকে নিঃশ্বেষ করে ঈশ্বরকে ক্ষমতাশূন্য করতে পেরেছে। এভাবে চম্পাবতী পরিস্থিতিকে আয়ত্তে এনে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক প্রকার দুর্বল নির্দেশনাও রেখে গেছে। তার বিপক্ষের শক্তির ওপর সে নিছক নিজের সমকক্ষের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেনি বরং নাটকটিতে দেখা যায়, এই শক্তিগুলোর ওপর নাট্যকার আরও বেশি পুরুষতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। মোড়ল নামক কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়ে চম্পা ছুটে যায় গয়া বেদের কাছে। আর অসহায়ের মত সতী নারীর সংজ্ঞা রক্ষার্থে ঈশ্বরের আরোপিত কর্তব্যে ন্যস্ত থাকে। সে নিজের সাথে নিষ্ঠুর নিয়তিরূপে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর বিশেষত গয়ার জীবনে

আসমানির আগমনের মতো ঘটনটির সামঞ্জস্য বিধান করেছে, আর সতী নারীর ন্যায় আসমানি ও গয়াদেবের যৌথ জীবন-যাপনের লক্ষ্যে নিজের ওপর বর্তানো দুর্দশার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। অবিসংবাদিতভাবে পুরুষরাই হলো সমাজের প্রভু, তারাই সমাজের বর্তমান বিন্যাস সাজায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। "কারণ নারীর কোন অতীত নেই, ইতিহাস নেই। 'তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে পুরুষদের মধ্যে"। [১১] নারীর সামাজিক মর্যাদা যুক্ত থাকে পিতা বা স্বামীর সাথে।

অবশ্য বর্তমান সময়ে কিছু নারী এই পুরুষদের ছাড়াই এগিয়ে যেতে পারছে। তারা (পুরুষেরা) যে তাদের আদিম ক্ষমতার কিছু পরিত্যাগ করেনি তা বুঝে মাঝে মধ্যে সামাজিক গতিবিধিতে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু "নারীর ইতিহাস নেই"।[১২] ইতিহাসের দীর্ঘ সময় জুড়ে এমনকি আজও নারী নির্বাক থেকেছে কিংবা থাকছে। অতীতে সে নিজে কথা বলতে পারে নি। "নারীর ইতিহাস নামে আমরা যে অধ্যায়গুলো পাঠ করি তার অনেক গুলোই পুরুষের ইতিহাসে নারী সম্পর্কিত অংশ/অধ্যায় মাত্র; তার রচিয়তাও পুরুষ।" [১৩] এরই ফলে নারী কথা বলে পুরুষের কথা বলার ধরনে। নারীকে তাইতো পুরুষের চিন্তা কাঠামোর সাথে নিয়ত সংগ্রাম করে সক্ষম হয়ে পুরুষ কর্তৃক তাকে নির্যাতনের ও বশীভূতকরণের থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, গড়তে হবে ভবিষ্যত, "মুক্তির জন্য সংগ্রামের ইশতেহার।"[১৪] ঈশ্বরের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে নারী ও পুরুষ অর্থাৎ উভয়েই 'আশরাফুল মাখলুকাত'[১৫] হলে স্ত্রী লিঙ্গধারীদের পুরুষের চেয়েও করুণ, ঘৃণ্য ও দীর্ঘতম শোষণের শিকার হতে হয়েছে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সব ধর্মে, সব দেশে, সব সমাজে নারীকে অপ্রধান করে রাখা হয়েছে। "যদিও, এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির তুলনায় পশ্চিমের মেয়েদেরকে মনে করা হয় উন্নত এবং স্বাধীন।" [১৬] কিন্তু দেখা যায়, এই একুশ শতকের পুরুষের তুল্য মর্যাদার দাবিদার নারী হলেও তাকে তা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। নারীর বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ যে ধর্ষণ, তাতেও পশ্চিমারা পিছিয়ে নেই। "২০১০ সালে পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতে ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ২২,১৭২। সেটাই মার্কিন দেশে প্রায় চারগুণ– ৮৪,৭৬৭"।[১৭] বিশ শতকের তিন দশক অতিবাহিত হওয়ার পরেও মুসলমান নারীদের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রাখার বিরুদ্ধে কলম ধরতে হয়েছিল বেগম রোকেয়াকে। হিন্দু সমাজেও আগে থেকেই ছিল কুপ্রথা। কেশবচন্দ্র সেনের মতো উদার মানুষও মনে করতেন, "বাঙালি নারী স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।"[১৮] একথা আজকের বাস্তবতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সামাজিক আবর্তনের কারণে একজন পুরুষ 'শোষক ও শোষিত' [১৯] এভাবে স্থান বদলাতে পারে কিংবা বদলাচ্ছে। কিন্তু নারী শোষণের বেলায় তারা সবাই এক। পৃথিবীর দীর্ঘতম ইতিহাস থেকে জানা যায়, একজন নারী শোষিত রূপেই জন্মগ্রহণ করে– তার নিয়তিতে যেন ঈশ্বর এমনটি লিখেছে। হাজার বছরের বঞ্চনা, যন্ত্রণা, নিপীড়নের চিহ্ন রয়েছে তার দেহ ও মনে। নারীকে ঘিরে পুরুষের শোষণের নকশা পদ্ধতিটি এতই সূক্ষ্ম যে, আজও নারী নিজেকে ভালভাবে চিনতে পারেনি। বর্তমান সময়েও দেখা যায় কোনো এক অজানা আশঙ্কায় নারী মেনে নিয়েছে পুরুষের আধিপত্য। আর পুরুষ নারীর সাথে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ থেকেও হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার সাথে অব্যাহত রেখেছে তাদের শোষণ প্রক্রিয়া। উপার্জন-উৎপাদন থেকে নির্বাসন এবং যৌনতা-মাতৃত্ব গৃহিনীপনায় সাফল্যের ওপর গড়ে ওঠে নারীত্বের সংজ্ঞা। আঁতুড় ঘর থেকে কবর অবধি এই বোধ নিপূণভাবে আত্মস্থ করতে, নির্ধারিত ভূমিকায় অভ্যস্ত হতে হতে সে সমাজের যোগ্য নারী হয়ে ওঠে। পিতৃতন্ত্রের লক্ষণরেখা নারীর চারপাশে গণ্ডী কেটে দেয়। পিতৃতন্ত্রের ভাষা সর্বত্র এক। হেলেন সিক্সাস খুঁজে বের করেছেন, এই ভাষার এক দ্বিমাত্রিক কৌশল, তুলনামূলক বৈপরীত্যের এক ছক, যার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় পুরুষের সক্রিয়তা ও মেয়েদের নিষ্ক্রিয়তা। যেমন– সূর্য, চন্দ্র, দিবস, যামিনী, মেধা, আবেগ, পুরুষ, নারী। ভাষার এই সূক্ষ্ম কৌশলে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে যন্ত্র ও যন্ত্রীর লিঙ্গভেদ সম্পর্কে। প্রথম লিঙ্গ পুংলিঙ্গ, যে প্রত্যক্ষ, ইতিবাচক, শক্তিমান, বিজয়ী। আর স্ত্রীলিঙ্গ

দ্বিতীয়, যে সবসময়েই অবলা, পুরুষের জয়ে গরবিনী। পুরুষের সমাজে নারী চিরকালই অবলা, অন্যজীব। এদের দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সিমোন দ্য বোভোয়া। একজন নারীর নারী হয়ে ওঠার প্রতিক্রা তাই আজও অব্যাহত আছে, পূর্ণতা পায়নি।

মোড়ল নামক কারাবাসে বন্দী হবার পর চম্পাবতীর মনে যে আবেগের সঞ্চারণ ঘটে, যা পূর্ব গয়াদেবের প্রতি ছিল এবং যেহেতু সে এই আবেগকে প্রকাশ করতে পারছিল না, সেহেতু তার ভেতর একরকম অসন্তুষ্টি বিরাজ করছিল। এই বিষয়টিকে বর্তমান প্রবন্ধে হতাশা হিসেবে দেখা হবে। এই হতাশাটি মোড়লের বিধি ব্যবস্থায় নিষেধ ছিল এই বিষয়টি সম্পর্কেও চম্পাবতী সম্পূর্ণ ওয়াকিবহল ছিল। এই নিষেধাজ্ঞা যতদিন চম্পাবতী সেই কারাবাসে বন্দি ছিল ততোদিন অবধি প্রচলিত ছিল। সভ্যতা মানুষকে আদিম পাশবিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, কিন্তু এরপরও সমাজের কিছু মানুষ এমন কিছু বিষয়ের অধীন হয়ে পড়ে, যার মাধ্যমে তারা অসামাজিক আচরণে লিপ্ত হয়ে পরে। এই তাড়নাজাত আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে ব্যভিচার, প্রাণনাশ করার লিপ্সা অর্ন্তগত। আকাঙ্ক্ষাগুলো পাশাপাশি স্থাপন করলে খুবই অদ্ভুদ শোনায়, ভাল-মন্দ সকল মানুষই বিষয়গুলো একযোগে প্রত্যাখ্যান করে। এমনই আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় মোড়ল চরিত্রটির মাঝে। যার ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীরা তার লোলুপ নজর এড়াতে পারে না।

'চম্পাবতী' পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায়, সমাজ ও প্রকৃতির কাছ থেকে আসা অনিষ্ট মোকাবিলায় চম্পার ভূমিকার কথা। কীভাবে নিয়তির বিপরীতে দাঁড়িয়ে মোড়লপত্নী নিজেকে ও চম্পাকে রক্ষা করেছে। এখানে দুই নারীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাদের লড়াইয়ের মূলে রয়েছে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি। যার মাধ্যমে তারা এগুতে পেরেছিল শত বন্ধুরতা সত্ত্বেও। পাণ্ডুলিপিতে আরও দেখা যায়, গয়া জীবনে চলার স্বার্থে আসমানিকে নতুন সঙ্গী হিসেবে নেয়। এই যে চম্পার জীবনে আসমানি নামক নতুন বন্ধুরতা তাও প্রকৃতির সৃষ্টি। পুরুষ জীবনে চলার পথে চিরতরে যবনিকা না টেনে নতুন উপায়ে বাঁচার অবলম্বন খুঁজে নেয়। কিন্তু চম্পার অবহেলিত দেহ মন এই বিষয়ে কোনো প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করেনি। তবু বাস্তবিক স্বার্থ থেকে উদ্বেলিত চম্পার মন একরকম উত্তর দাবি করে আবার সে গয়ার জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা চায়, নিজ আশা জলাঞ্জলি দিয়ে। এত ত্যাগের পরও চম্পা প্রতিরক্ষাহীন থেকে যায়। চম্পা জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার লড়াইয়ে প্রচলিত পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটায়। এভাবে সে গয়াকে তুষ্ট করার, প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে এবং কিছু মাত্রায় তাকে নিজের প্রতি আসক্ত করতে পারে। কিন্তু চম্পা যে উপায়কে অবলম্বন করেছে তাতে পুরুষতন্ত্রের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখা যায়। আমাদের সমাজে অবিসংবাদিতভাবে পুরুষ হলো নারীর প্রভু, তারাই নারীর জীবনের বিন্যাস করে। অবশ্য কোনো কোনো নারী এই পুরুষ নামধারী ঈশ্বরদের ছাড়াই চলতে পারে। তবে তারা তাদের আদিম ক্ষমতার কিছু পরিমাণ ত্যাগ না করে নারী সম্প্রদায়কে বোঝানোর জন্য মাঝে মাঝে কিছু ঘটনার মাধ্যমে নারীর গতিবিধিতে হস্তক্ষেপ করে। আর এভাবেই সমাজে তৈরি হয়েছে দৃশ্যের ভাণ্ডার। এ জগতে যা কিছু ঘটে তার সবই সাধারণ থেকে উচ্চতর এক চৈতন্যের অভিপ্রায়ের প্রকাশ বলে অধিকাংশ নারী মেনে নেয়। এর সাথে সাথে তাদের অবলা মন মনে করে পুরুষের বিরুদ্ধে সরল বা ঘুরতিপথ অনুসরণ না করে এক প্রকার ভালোর দিকেই ধাবিত হওয়া উচিত। চম্পা বুঝতে পেরেছিল গয়াকে সাপে কাটার মধ্য দিয়ে যে দুর্দশার সূচনা হয়েছে তাতে তাদের প্রেমের বিলুপ্তি নয়, নিষ্প্রাণ অজৈব অবস্থায় ফিরে যাওয়া নয় বরং নতুন এক অস্তিত্বের সূচনা করতে হবে, যা আরও উচ্চতর কোনো বিকাশের পথ বেয়ে এগিয়ে গেছে। আর তাই তো সে শুষে নিয়েছিল গয়ার শরীরের সমস্ত বিষ। সে যে পথে চালিত হচ্ছিল তার বীজমন্ত্র তার জানা ছিল না। ছিল কেবল একটি প্রত্যয়– সখা গয়াকে যে কোনো মূল্যে বাঁচাতে হবে। এভাবে যাবতীয় ভীতি, দুর্ভোগ এবং

জীবনের গ্লানি মুছে যায় চম্পার। এই মানুষটির ওপর নির্ভর করছে অবলা নারী চম্পার ভবিষ্যত। অন্তত বঙ্গীয় সমাজ এখানকার অবলা নারীদের এভাবেই শিক্ষা দেয়। পতি বিনা স্থান নেই নারীর পতিগৃহে। একটা শক্তিশালী অথচ অবদমিত ইচ্ছাবেগের ফলে চম্পার স্বপ্নগঠন সম্ভব হয়েছে। জ্বলন্ত অঙ্গার যেমন নিজ ভস্ম নিজেই সঞ্চয় করে রাখে, চম্পা তেমনি নিজের স্তূপাকার কার্যাবশেষের মাধ্যমে নিজেকে নিহিত করেছে, তার চারপাশে অবসর বলে কোনো শব্দের উপস্থিতি নেই। "এই প্রলয়কারিনী কার্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে, এই অগ্নিতে কেবল শয়নগৃহের সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতেছে, শীতার্ত প্রাণীর শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত প্রাণীর অন্ন প্রস্তুত হইতেছে। যদি আমাদের সাহিত্যে এই সুন্দরী বহ্নিশিখাগুলির তেজ দীপ্যমান হইয়া থাকে তবে তাহা লইয়া এত তর্ক কিসের জন্য।" [২০] প্রবল ইচ্ছাশক্তির পক্ষে লড়তে গিয়ে চম্পা হয়তো কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেছে কিন্তু তাকে স্বীকার করতে হয়েছে বিপুল পরিমাণ ত্যাগ। শত কষ্টের পর চম্পার প্রাপ্তি কেবল একটুকু– সে গয়াবেদের জীবন বাঁচিয়ে সমাজের কাছে যোগ্য স্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে। যথার্থ সম্মান সে পায়নি। আজ বর্তমান সময়ে দাড়িয়েও নারীর সামাজিক অবস্থানের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সেটুকু পরিবর্তন এসেছে তা হলো স্বাতন্ত্র্য হারানোর পরিবর্তন। নারী মানুষ হিসেবে আজও সাধারণ মনুষত্ব্যের সম্মান পায়নি। আজ সমগ্র বিশ্বে এত অগ্রগতি সত্ত্বেও তার প্রতি অসাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়নি। বৌদ্ধিক জীব হিসেবে নারী পুরুষের সাম্য কার্যত স্বীকৃত হয়নি। এখনও চলে নারীকে নিয়ে পরিহাস এবং মুখোশের আড়ালে নারী নির্যাতন।

বিশাল এই পৃথিবীতে ক্ষুদ্র নারী চম্পা। যে-কি না প্রচলিত নিয়মকে অঙ্গে জড়িয়ে বহু পরিশ্রমের পর তার চেষ্টিত ফল উদ্ধারে সক্ষম হয়। অবশ্য এর কোনো বিকল্পও ছিল না, অন্য কোনোভাবে চিন্তা করার উপায়ও ছিল না। এ চিন্তাধারা অবশ্যই বাস্তব উদ্দেশ্য আছে এবং এই চিন্তাধারা কোনোভাবেই নির্লিপ্ত কৌতূহলের বহিঃপ্রকাশ নয়। এমন ঘটনার পক্ষে টেক্সটটি সাজানো হলে সমগ্র আখ্যানটি পাঠকের কাছে অবাস্তব বলে মনে হতো। চম্পার জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা ছিল সে নারী, যার সমগ্র জীবন সংসারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত থাকবে। আর তাই পরবর্তীতে এই শিক্ষাকে সামনে রেখে সে নিজের অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত উপাদানের সাথে মোকাবিলা করেছে। আর এভাবেই সে অভিষ্ট্য লক্ষ্য অর্থাৎ সমাজের চোখে যোগ্য নারী হয়ে উঠতে পেরেছে। মোটের ওপর চম্পার উদ্দেশ্য সাধন প্রচেষ্টায় কোন অবিশ্বস্ততা, অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। নিয়তির কাছ থেকে আসা বিপদগুলোর প্রেক্ষিতে সে এগিয়ে গেছে ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করেছে। চম্পা জীবনের অসহনীয় মুহূর্তেও তার মানবীয় স্বভাব হারায়নি। জীবনের কঠিন সময়ে সঠিক দিক নির্দেশনা না পেয়েও সে নিজেকে একভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। আবেগী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হওয়া এক নারী চম্পা। তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নতুন প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটেছে, যা আরও উচ্চতর কোনো বিকাশের পথ বেয়ে এগিয়ে গিয়েছে। বঙ্গীয় যাবতীয় আদর্শ থেকে যে চম্পার জন্ম হয়েছিল, চাইলেই সেই আদর্শ থেকে সে বের হয়ে আসতে পারেনি। আর পারেনি বলেই বঙ্গের এক পক্ষ চম্পাকে আদর্শ নারী বলে আখ্যায়িত করবে। কিন্তু একজন পুরুষের মতোই তারও ছিল চাহিদা, সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনা। কিন্তু এই চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে সে নিজেকে নিজেকে শূন্যে নিক্ষেপ করে। চম্পা নারী একথা যেমন ধ্রুব সত্য, তেমনি সত্য সে একজন মানুষ। যে কথা অনুচ্চারিত ছিল, যে অনুভুতি এতদিন উহ্য ছিল, গোপন ছিল, উপেক্ষিত ছিল পিতৃতন্ত্রী নন্দনতত্ত্বে তার যথার্থ উন্মোচন নাট্যকার শামসুল হক যথার্থভাবেই করেছেন। আর এটা সম্ভব হয়েছে বলে চম্পা একজন নারী থেকে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, এরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব, (ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ডিসেম্বর, ২০০০), পৃ. ২৯।
২. সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮), পৃ. ৯০।
৩. লুবনা মারিয়াম– বাংলাদেশের বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী, শিল্প নির্দেশক, গবেষক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের নাম সাধনা কল্পতরু নামে তাঁর আরেকটি নৃত্যের শাখা আছে। সাধনা মূলত তাদের প্রতিটি কাজ নিয়ে গবেষণা ও কর্মশালার আয়োজন করে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শিল্পীবৃন্দ এই কর্মশালাগুলো পরিচালনা করে। অতপর তারা পূর্ণাঙ্গ পরিবেশনার আয়োজন করে।
৪. সৈয়দ শামসুল হক, কবি জসীম উদদীনের 'বেদের মেয়ে' অবলম্বনে কাব্যগীতি, (ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি-২০১৪), পৃ. ৫৭।
৫. অনুবাদ: হুমায়ুন আজাদ, সিমোন দ্য বোভোয়ার, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ৬ষ্ট মুদ্রন, জানুয়ারী ২০১২), পৃ. ১৯।
৬. তদেব, পৃ. ১৯।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২১
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
১২. জোহরা পারুল, নারীর ইতিহাস, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭), পৃ. ১১।
১৩. তদেব, পৃ. ১১।
১৪. তদেব, পৃ. ১১।
১৫. আসরাফুল মাখলুখাত শব্দের অর্থ সৃষ্টির সেরা জীব।
১৬. জাহিরুল হাসান, মুসলিম নারী, (কলকাতা: বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, জানুয়ারি, ২০১৭), পৃ. ১১।
১৭. তদেব, পৃ. ১১।
১৮. তদেব, পৃ. ৪৪।
১৯. তদেব, পৃ. ১১।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ সমগ্র, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, জুলাই, ২০০৭), পৃ. ২৯।